Department of Political Science

By: Dr. Prafulla Kumar Das

Semester-IV (General Course)

DSC-1D (CC-4): Introduction to International Relations Credit 06

DSC1DT: Introduction to International Relations

Course Content:

1. Approaches to International Relations

b) Neo-Liberalism: Complex Interdependence (Robert O. Keohane and Joseph Nye)

উদারনীতিবাদ বা উদারপন্থী মতবাদ (ইংরেজি: Liberalism)) সাম্য ও মুক্তির উপর নির্ভর করে সৃষ্ট একধরনের বৈশ্বিক রাজনৈতিক দর্শন। এ দুইটি নীতির উপর ভিত্তি করে উদারতাবাদকে অনেক বিস্তৃত আকার দেওয়া হয়েছে। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন, জনগণের অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, মুক্তবাণিজ্য, ব্যক্তিগত মালিকানা প্রভৃতি ধারণার উদ্ভব ঘটেছে এ দর্শনের উপর ভিত্তি করে। উদারতাবাদের ইংরেজি Liberalism উদ্ভব হয়েছে লাতিন শব্দ liberalis থেকে।

উদারনীতিবাদের সাধারণ অর্থ হলো রাষ্ট্রীয় কতৃত্ববাদ এর বিরুদ্ধে ব্যক্তিস্বাধীনতা নীতি প্রতিষ্ঠা করা। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হব হাউসের মতে উদারনীতিবাদ হলো এমন একটি মতবাদ যেখানে প্রতিটি মানুষের স্বাধীনতা জীবনের কণ্ঠস্বর তাদের চিন্তা বিকাশ-এ বিকশিত হয়।উদারনীতিবাদের প্রধান ও প্রতিপাদই হলো স্বাধীনতা। উদারনীতি এমন একটি রাজনৈতিক মতবাদ যেখানে ব্যক্তির স্বাধীনতাকে রক্ষা করা ও এর উন্নতিসাধন করাকে রাজনীতির মূল সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। উদারপন্থীরা বিশ্বাস করেন ব্যক্তিবিশেষকে অন্যদের সৃষ্ট ক্ষতির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য সরকারের প্রয়োজনীয়তা আছে, কিন্তু তারা এও বিশ্বাস করেন যে সরকার নিজেও ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্য হুমকি হতে পারে। মার্কিন বিপ্লবী লেখক টমাস পেইন ১৭৭৬ সালে লিখেছিলেন যে সরকার এক ধরনের "প্রয়োজনীয় মন্দলোক"। ব্যক্তির স্বাধীনতা ও জীবন সুরক্ষার জন্য আইন, বিচারব্যবস্থা ও পুলিশের দরকার আছে, কিন্তু এগুলির দমনমূলক ক্ষমতা ব্যক্তির বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হতে পারে। সুতরাং সমস্যা হচ্ছে এমন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা সৃষ্টি করা যাতে

ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার জন্য সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা থাকবে কিন্তু একই সাথে সেই ক্ষমতার যাতে অপব্যবহার না হয়, সেটিও প্রতিরোধের ব্যবস্থা থাকবে।

রাজনৈতিক দর্শনের একটি বিশেষ মতবাদ হিসেবে উদারতাবাদের বয়স দেড়শ বছরের কিছু বেশি হলেও এর উৎস মূল ষোড়শ শতাব্দীর রেনেসাঁ ও রিফর্মেশন আন্দোলন পর্যন্ত বিস্তৃত। রেনেসাঁ ও রিফর্মেশন আন্দোলনে ব্যক্তিকে তার স্বকীয় সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে প্রয়াস চালানো হয় তার পরোক্ষ ফলশ্রুতি হিসেবে উদারতাবাদের জন্ম হয়। উদারতাবাদ তার বিকাশপথে প্রথমে একটি নেতিবাচক আন্দোলন হিসেবে, এবং পরে একটি ইতিবাচক আদর্শ হিসেবে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। নেতিবাচক আন্দোলন হিসেবে এটি যুগ যুগ ধরে মানুষের প্রগতি ও মুক্তির পথে সৃষ্ট বাধাসমূহকে দূর করার কাজে নিয়োজিত হয় এবং ইতিবাচক আদর্শ হিসেবে মানুষের মধ্যে যে বিপুল শক্তি ও সম্ভাবনা প্রোথিত রয়েছে তার সার্থক বিকাশ সাধনের মাধ্যমে মানুষকে তার স্বকীয় সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করার কাজে ব্রতী হয়। উদারতাবাদ যদিও মূলত একটি রাজনৈতিক আন্দোলন, তবু তা শুধুমাত্র রাজনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনেও সম্প্রসারিত হয়েছে। জন হলওয়েলের মতে, *উদারতাবাদ নিছক একটি চিন্তাধারা নয়, এটি একটি জীবনদর্শনও বটে। জীবনদর্শন হিসেবে তা মানুষের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক আকাঙ্ক্ষাসমূহকে প্রতিফলত করে।*

ধর্মীয় আন্দোলন হিসেবে উদারতাবাদ রোমান ক্যাথলিকবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় এবং ক্যালভিনপন্থীদের, ফরাসী হুগুয়েনটদের ও অন্যান্য প্রটোস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্বাধীনতার সংগ্রামকে রাজনৈতিক সমর্থন প্রদান করে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধকালে উদারতাবাদ ব্রিটিশ নন-কনফর্মিস্ট আন্দলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে এবং রোমান ক্যাথলিক চার্চের বিশেষাধিকারের দাবিকে নস্যাৎ করে দেয়। মোট কথা, সপ্তদশ শতাব্দী থেকে উদারতাবাদ শুধু যে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ থেকে স্বাধীন ধর্মাচরণের অধিকারকে রক্ষা করার চেষ্টা করে তাই নয়, চার্চের প্রভাব থেকে সরকার ও সরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহকে মুক্ত করার প্রয়াসেও লিপ্ত হয়।

(Neo-liberalism)

▲ নয়া-উদারনীতিবাদ কী এবং কেন?

নয়া-উদারনীতিবাদকে কখনও কখনও নয়া-ধ্রুপদি (neo-classsical) উদারনীতিবাদ নামে অভিহিত করা হয়। নয়া-উদারনীতিবাদ আর্থনীতিক উদারনীতিবাদের পুনরুজ্জীবনের কথা বলে। এটি হল প্রতিবিপ্লবী মতবাদ যার লক্ষ্য হল রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের গতিকে স্তব্ধ করে দেওয়া (Neo-liberalism, sometimes called neo-classical liberalism, refers to a revival of economic liberalism... Neo-liberalism is counter-revolutionary, its aim is to halt the trend towards state intervention. Heywood, p. 54). নয়া-উদারনীতিবাদ হল এক ধরনের বাজার মৌলবাদ (market fundamentalism)। বাজার মৌলবাদ এই কারণে যে বাজার অর্থনীতি বা বাজার হল সমগ্র সমাজব্যবস্থার অন্যতম চালিকা শক্তি। বাজারকে সরকারের চেয়ে উন্নত ব্যবস্থা বলে মনে করা হয়। নয়া-উদারনীতিবাদ যদি বাজার মৌলবাদের কথা বলে তাহলে মুনাফার সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীতকরণকে বোঝায়। (Neo-liberalism meant the unambiguous reassertion of the maximisation of the profit rate in every dimension of activity. Socialist Register, 2002, p. 65). তাহলে দেখা যাচ্ছে যে নয়া-উদারনীতিবাদ রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ও বিপুল ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তে আর্থনীতিক উদারনীতিবাদ। ব্যক্তি-মালিকানা ও বাজার মৌলবাদের প্রাধান্য চায়। বাজারকে নৈতিক ও বাস্তবাদিক থেকে উন্নত চালক বলে নয়া-উদারনীতিবাদের সমর্থকগণ দাবি করেন এবং বাজারের আচরণের মধ্যে থাকে নিরপেক্ষতা।

নয়া-উদারনীতিবাদ বলতে কী বোঝায়?

আধুনিককালের অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী নয়া-উদারনীতিবাদকে নয়া-অধিকার (New Right) নামে অভিহিত করতে চান। নয়া-অধিকার এই কারণে যে বিশ শতকের প্রায় গোড়া থেকে আরম্ভ করে স্নায়ুযুদ্ধের অবসান কাল অবধি প্রায় সাতটি দশক রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার চিত্রটি কেবল বহন করেছে। রাষ্ট্রের ক্ষমতার এই রমরমা অবস্থার চাপে পড়ে সাধারণ মানুষের অধিকার, স্বাধীনতা, উৎসাহ, উদ্দীপনা ও উদ্যোগ সবই ম্রিয়মান হয়ে পড়েছিল এবং এগুলির পুনরুজ্জীবনের তাগিদ অনুভব করায় বহু ব্যক্তি রাষ্ট্রের ক্ষমতার সংকোচনের কথা ভাবতে বসেন এবং তা যে করতে হলে ব্যক্তির ক্ষমতা, অধিকার, স্বাধীনতার সম্প্রসারণ জরুরি তা তারা এক বাক্যে স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। সুতরাং, নয়া-উদারনীতিবাদ হল নয়া-অধিকারের পুনরুজ্জীবন ঘটানো। নতুন নতুন আর্থনীতিক ক্ষেত্রে বাজারের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে ব্যক্তির অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করা। আর্থনীতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ সর্বনিম্ন স্তরে নামিয়ে আনা। রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে কোনো কোনো গোষ্ঠী যে অফুরন্ত ক্ষমতার আধারে পরিণত হয়েছিল তার পরিসমাপ্তি করা। (Political programme of New Right (or neo-liberals) includes : The extension of the market to more and more areas of life, the creation of a state stripped of 'excessive' involvement both in economy and in the provision of opportunities, the curtailment of the power of certain groups to press their aims and goals. Held, p. 139). সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে নয়া-উদারনীতিবাদ ও নয়া-অধিকারকে একটিমাত্র বন্ধনীর মধ্যে রাখার পক্ষপাতী অনেকে। কারণ নয়া-অধিকার ও নয়া-উদারনীতিবাদ উভয়ের লক্ষ্য কিন্তু এক—ব্যক্তিকে সমস্ত প্রকার অধিকার ও সুযোগ দেওয়া ও উদ্যোগ গ্রহণে যথাযথ সাহায্য করা।

নয়া-উদারনীতিবাদ এবং নয়া-অধিকার

স্নায়ুযুদ্ধের তীব্রতা ও প্রভাব দুইই হ্রাস পাওয়ার ফলে রাজনীতি, রাষ্ট্রতত্ত্ব ও মতাদর্শের জগতে দেখা দিল কতকগুলি পরিবর্তন যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নয়া-উদারনীতিবাদ। স্নায়ুযুদ্ধের মধ্যাহ্নকালীন অবস্থায় আমেরিকা ও রাশিয়া দুই-পরাশক্তি নিজেদের সামরিক ক্ষমতার উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হলেও এটি যখন সমাপ্তির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল তখন রাশিয়াসহ বিশ্বের নানা স্থানে সমাজবাদের উৎকর্ষ স্তিমিত হওয়ার মুখে। পণ্ডিতেরা অভিযোগ করে বলেন (এঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ডেভিড হেল্ড) স্নায়ুযুদ্ধের দৃষ্টিভঙ্গি এবং স্তালিনবাদ সমাজবাদকে বেইজ্জত করেছে (Cold War attitudes and Stalinism have discredited certain socialist ideas in the eyes of the many. Held, p. 139)। স্তালিন যে সামরিক মানসিকতা নিয়ে কঠোর হস্তে রাশিয়া শাসন করেছিলেন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করে ব্যক্তিকে জড় পদার্থে পরিণত করে ফেলতে উদ্যত হয়েছিলেন তা দেখে অনেকে সমাজবাদ সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ করতে লাগলেন এবং সমাজবাদের এই অবস্থা উদারনীতিবাদ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনে উৎসাহ সঞ্চার করেছিল। আটের দশকে ব্রিটেনে মার্গারেট থ্যাচার ও আমেরিকায় রেগন রাষ্ট্রের অফুরন্ত ক্ষমতার ওপর বিধি নিষেধ আরোপের উদ্যোগ নিতে শুরু করেন এবং তার ফলশ্রুতি হল নয়া-উদারনীতিবাদের আবির্ভাব। রেগন ও থ্যাচারের এই উদ্যোগকে নয়া-অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন নামে অনেকে মনে করতে লাগলেন। নয়া-অধিকার হল ব্যক্তির অধিকার যা অতীতে ছিল কিন্তু নানা কারণে চাপা পড়ে যায়। তারপর এল বিশ্বায়ন। জাতি-রাষ্ট্রকে একেবারে কোণঠাসা করে ফেলেছিল এই বিশ্বায়ন। জাতি-রাষ্ট্রের ক্ষমতার সংকোচন মানে ব্যক্তি-স্বাধীনতার সম্প্রসারণ। আর নয়া-উদারনীতিবাদ সেদিকে অগ্রসর হওয়ার কথা বলে। সুতরাং, নয়া-উদারনীতিক মতাদর্শকে একাধিক রাজনীতিক ঘটনার ফসল বলে মনে করলে অন্যায় হয় না।

নয়া-উদারনীতিবাদের আবির্ভাব

(ক) জটিল পারস্পরিক নির্ভরশীলতার তত্ত্ব (Complex Interdependence Theory)

বহুত্ববাদী ধারায় জটিল পারস্পরিক নির্ভরশীলতার তত্ত্বের প্রবক্তা হলেন রবার্ট কোহেন এবং জোসেফ নাই। কোহেন ও নাই তাঁদের বিখ্যাত গ্রন্থে জটিল পারস্পরিক নির্ভরশীলতা তত্ত্বের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মতে রাষ্ট্র এবং অ-রাষ্ট্রীয় কারকগুলি একাধিক ক্ষেত্রে আপস করবার চেষ্টা করে। বহুমুখী যোগসূত্র আন্তঃরাষ্ট্রীয়, আন্তঃসরকারি এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও নির্ভরতার ভিত্তি প্রস্তুত করতে পারে। আজকের দিনে কূটনীতি মূলত পরিচালিত হয় অ-রাষ্ট্রীয় স্তরে বিভিন্ন দেশের জনগণের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে। পাশাপাশি আজকের দিনে সামরিক সম্পর্কের বাইরে অসামরিক বিষয়গুলি যেমন—পরিবেশ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

রবার্ট কোহেন ও জোসেফ নাই-এর মতে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সামরিক এবং অসামরিক ইস্যুগুলির ক্রমোচ্চশীলতা নির্ণয় করাও আজকের দিনে সম্ভব নয়। উপরন্তু, কোহেন এবং নাই মনে করেন সাম্প্রতিককালে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সামরিক শক্তির প্রয়োগ যথেষ্ট পরিমাণে কমেছে। রবার্ট কোহেন এবং জোসেফ নাই জটিল পারস্পরিক নির্ভরশীলতার তত্ত্বের যে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন, সেগুলি হল—

(ক) রাষ্ট্রপ্রধান ও অ-রাষ্ট্রীয় কারকদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনে একাধিক যোগসূত্র রয়েছে।

(খ) রাষ্ট্রগুলির জটিল পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সামরিক শক্তির ভূমিকা অনেক নিয়ন্ত্রিত ও সংযত।

(গ) জটিল পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ক্ষেত্রে যে কোনো বিষয়ই পরিস্থিতি অনুযায়ী গুরুত্ব পেতে পারে।

(ঘ) সম্পর্ক বজায় রাখা ও গঠন করার একাধিক প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি আছে। সম্পর্ক তাই বিবিধ প্রকার ও বিবিধ স্তরের আন্তঃরাষ্ট্রীয় অধি-সরকারি বা অধি-জাতীয়।

(ঙ) জটিল পারস্পরিক নির্ভরতা সামরিক শক্তির একচেটিয়া প্রয়োগ সীমিত করে।

৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে ৭০-এর দশকের শেষার্ধ পর্যন্ত বহুত্ববাদ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্ব গঠনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। সিদ্ধান্ত গ্রহণ তত্ত্ব ৫০-র দশকে রিচার্ড স্নাইডারের হাত ধরে শুরু হলেও পরবর্তী পর্যায়ে রবার্ট জরভিস, গ্রাহাম আলিশন প্রমুখদের রচনায় আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পারস্পরিক জটিল বাতাবরণের মাধ্যমে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সেই বিষয়টি উল্লেখিত হয়েছিল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপকরণ অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তার করে। বিভিন্ন গোষ্ঠী দেশের ভিতরে এবং বাইরে কীভাবে একটি রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সে বিষয়টি স্নাইডার তুলে ধরেছিলেন। অন্যদিকে আলিশন তাঁর আলোচনায় রাষ্ট্রের একপাক্ষিক ভাবমূর্তিকে খণ্ডন করে তার বিভিন্ন স্তর ও উপাদানের বিন্যাস তাত্ত্বিক আকারে তুলে ধরেছিলেন। সংক্ষেপে বলা যায় জটিল পারস্পরিক নির্ভরশীলতার তত্ত্বের প্রবক্তারা সরকারি ও বেসরকারি অধিজাতীয় এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠান পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে বহুত্ববাদী ঘরানার প্রভাবে কীভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সুনিশ্চিত হয় সে বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

Complex interdependence

- Complex interdependence in international relations is the idea put forth by Robert Keohane and Joseph Nye.

- The term "complex interdependence" was claimed by Raymond Leslie Buell in 1925 to describe the new ordering among economies, cultures and races.

- The very concept was popularized through the work of Richard N. Cooper (1968). With the analytical construct of complex interdependence in their critique of political realism, "Robert Keohane and Joseph Nye go a step further and analyze how international politics is transformed by interdependence" .

- The theorists recognized that the various and complex transnational connections and interdependencies between states and societies were increasing, while the use of military force and power balancing are decreasing but remain important.

- In making use of the concept of interdependence, Keohane and Nye also importantly differentiated between interdependence and dependence in analyzing the role of power in politics and the relations between international actors.

- However , complex interdependence is characterized by three characteristics, involving (1) the use of multiple channels of action between societies in interstate, transgovernmental, and transnational relations, (2) the absence of a hierarchy of issues with changing agendas and linkages between issues prioritized and the objective of (3) bringing about a decline in the use of military force and coercive power in international relations.

Nye and Keohane thus argue that the decline of military force as a policy tool and the increase in economic and other forms of interdependence should increase the probability of cooperation among states. The work of the theorists surfaced in the 1970s to

become a significant challenge to political realist theory in international politics and became foundational to current theories that have been categorized as liberalism (international relations), neoliberalism and liberal institutionalism. Traditional critiques of liberalism are often defined alongside critiques of political realism, mainly that they both ignore the social nature of relations between states and the social fabric of international society. With the rise of neoliberal economics, debates, and the need to clarify international relations theory, Keohane (2002: 2-19) has most recently described himself as simply an institutionalist, nothing purpose for developing sociological perspectives in contemporary International relations theory. Liberal, neoliberal and neoliberal institutional theories continue to influence international politics and have become closely intertwined with political realism

2.3 বহুত্ববাদী তত্ত্ব

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বহুত্ববাদী তত্ত্বের উদ্ভব হয় ১৯৭০ দশকে। বহুত্ববাদী তত্ত্বের সমর্থকগণ উদারবাদী তত্ত্বের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করেছেন। এই তত্ত্বের প্রবক্তাগণ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বাস্তববাদী তত্ত্বের বিরোধিতা করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই বহুত্ববাদী তত্ত্বের উদ্ভব দেখতে পাওয়া যায়। **আর. ও. কেওহান** (R. O. Keohane) ও **জে. এস. নাই** (J. S. Nye) হলেন এই তত্ত্বের মুখ্য প্রবক্তা।

বাস্তববাদীরা রাষ্ট্রকে বিশ্বরাজনীতির প্রধান কারক হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। তাঁরা রাষ্ট্রকে এক অখণ্ড, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু বহুত্ববাদীরা এর বিরোধিতা করে বলেছিলেন যে, বাস্তববাদীদের এই ধারণা সঠিক নয়। তাঁরা বলেছিলেন, বিভিন্ন রাষ্ট্র নিজেদের মধ্যে এক পারস্পরিক নির্ভরশীলতার বন্ধনে আবদ্ধ। এই নির্ভরশীলতার ধারণা অত্যন্ত জটিল। এর ফলে বাস্তববাদী তাত্ত্বিকগণ দ্বারা প্রদত্ত রাষ্ট্রের চিত্র বর্তমানে আর সমর্থন করা যায় না।

১৯৭০-এর দশক থেকেই বিশ্ব-রাজনীতি এক জটিল আকার ধারণ করেছিল। সেই সময় থেকেই এটা অনুধাবন করা সম্ভব হয়েছিল যে, রাষ্ট্রকেন্দ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই প্রবণতা বিশ্লেষণ করা সম্ভব হবে না। এই সময় দেখা যায় যে, বিশ্ব-রাজনীতিতে বহু কারকের আবির্ভাব ঘটেছে। এরা বিশ্ব-রাজনীতিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে এবং বিশ্বসমাজকেও নিয়ন্ত্রিত করেছে। সুতরাং, রাষ্ট্রই যে বিশ্ব-রাজনীতির একমাত্র কারক—এ ধারণার ক্ষেত্রে কুঠারাঘাত করা হয়। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন গণমাধ্যম,

রোমান ক্যাথলিক চার্চ, বহুজাতিক সংস্থা ইত্যাদি কারকের ভূমিকার উল্লেখ করা যেতে পারে। এসব কারকগুলি রাষ্ট্র-নিরপেক্ষভাবেই বিশ্ব-রাজনীতির ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

বহুত্ববাদীদের মতে, রাষ্ট্র ব্যতীত অন্যান্য কারকদের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব বিশ্ব-রাজনীতিতে হিংসা ও বলপ্রয়োগের আধিক্যকে অনেকাংশেই হ্রাস করবে। বিরোধের জায়গায় পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে বিশ্ব-রাজনীতি পরিচালিত হবে। সেজন্য বহুত্ববাদী তাত্ত্বিকগণ বলেছেন, সহযোগিতা বিশ্ব-ব্যবস্থার এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে।

বহুত্ববাদীরা পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে জনমতের গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করেছেন। বিদেশনীতি সরকার দ্বারা প্রণীত ও কার্যকর হলেও তা দেশের সাধারণ মানুষকেই প্রভাবিত করে। এই মানুষদের চাহিদা আমলারা যথাযথভাবে সবসময় অনুধাবন করতে পারেন না। এগুলির সম্যক অনুধাবন করতে সক্ষম বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীগুলি। এই কারণে বহুত্ববাদীরা এই অভিমত পোষণ করেন যে-দেশের পররাষ্ট্র নীতি, প্রণয়নে এইসকল স্বার্থগোষ্ঠীর সঙ্গে সংযোগ রাখা একান্তভাবেই আবশ্যিক। বহুত্ববাদীরা কেবল এইসকল স্বার্থগোষ্ঠীর ভূমিকাকেই স্বীকার করে না, তাঁরা পররাষ্ট্র মন্ত্রকের আমলাতন্ত্রের সঙ্গে সরকারের অন্যান্য বিভাগের আমলাতন্ত্রের ভূমিকার প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এঁরা বলেন যে, এইসকল বিভাগের আমলাগণ দেশের পররাষ্ট্রনীতিকে বিভিন্ন দিকে পরিচালনা করে থাকে।

বহুত্ববাদীরা বলেন, বর্তমানে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা অতি-জাতীয় শক্তির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। কেবলমাত্র জাতীয় নিরাপত্তা নয়, বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয় বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্মুখে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। নিজের দেশের মধ্যে না ঘটলেও, অন্য দেশের ঘটনা থেকে কোনো দেশ নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, সন্ত্রাসবাদ বা বিশ্ব উষ্ণতা (Global Warming) হল এমন সমস্যা যার দ্বারা পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশ আজ কোনো-না-কোনো ভাবে আক্রান্ত। ফলে এই সমস্যাগুলি নিরসন করার জন্য যখন কোনো একটি দেশ পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সম্মেলন আহ্বান করে তখন তাতে অংশগ্রহণ করতে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বিভিন্ন বিশেষীকৃত গোষ্ঠীসমূহ উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

বহুত্ববাদীরা 'প্রভাব রাজনীতি' (influence politics)-র ধারণার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বাস্তববাদীদের দ্বারা প্রদত্ত 'ক্ষমতা রাজনীতি' (Power politics)-র বিপরীত ধারণা হল এই 'প্রভাব রাজনীতি'। যেখানে বাস্তববাদীরা বলপ্রয়োগের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন, সেখানে বহুত্ববাদীরা বলপ্রয়োগের অপ্রয়োজনীয়তার বিষয় উল্লেখ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, যদি দেশের পররাষ্ট্রনীতির বেশির ভাগটাই রাষ্ট্র দ্বারা পরিচালিত না হয়ে স্বার্থগোষ্ঠী ও বেসরকারি সংগঠন দ্বারা পরিচালিত হয় তাহলে বলপ্রয়োগের আর প্রয়োজন থাকবে না।

বহুত্ববাদীরা বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যেকার যে ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতার কথা বলেছেন তার ফলে রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা ও স্বাধীনতা ব্যাহত হয়। বহুত্ববাদীরা রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী। কারণ তাঁরা বলেছেন, এর ফলেই মানবসভ্যতা রক্ষা করা সম্ভব।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এক অভিনব তত্ত্ব হল বহুত্ববাদী তত্ত্ব। ১৯৭০-এর দশক থেকে শুরু করে বর্তমান কালের বিশ্ব-রাজনীতির সঠিক প্রতিফলন ঘটেছে বহুত্ববাদী তত্ত্বে। তবে এ তত্ত্বটি যে সমালোচনার ঊর্ধ্বে এ কথা বলা যায় না। বিভিন্ন দিক থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বহুত্ববাদী তত্ত্বটি সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে।

বহুত্ববাদীরা বিশ্বব্যবস্থায় রাষ্ট্রের প্রাধান্যকে অস্বীকার করে অন্যান্য কারকের ওপর গুরুত্ব প্রদানের

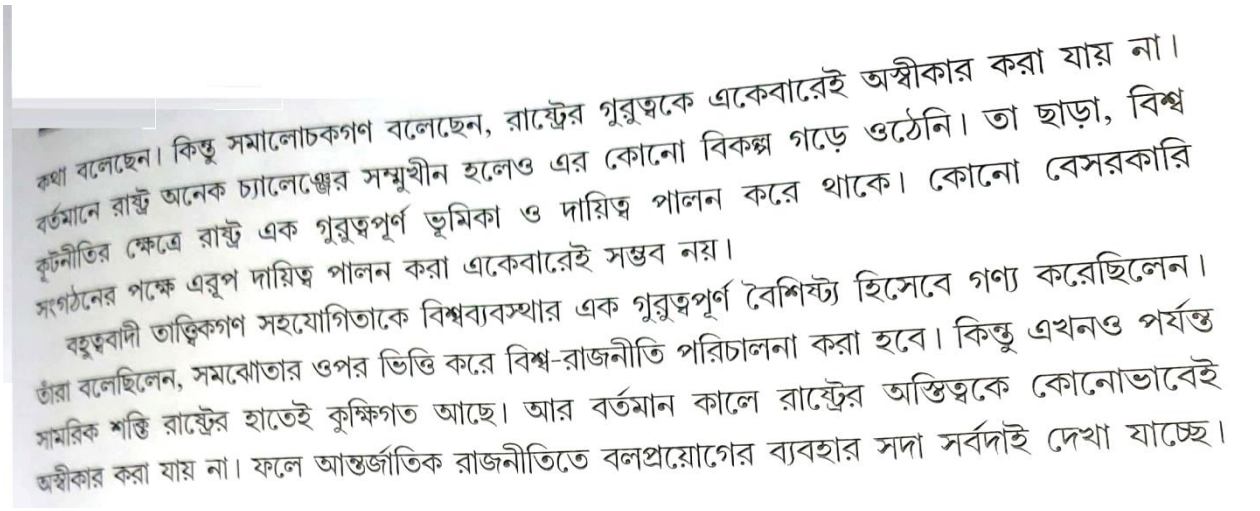

কথা বলেছেন। কিন্তু সমালোচকগণ বলেছেন, রাষ্ট্রের গুরুত্বকে একেবারেই অস্বীকার করা যায় না। বর্তমানে রাষ্ট্র অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলেও এর কোনো বিকল্প গড়ে ওঠেনি। তা ছাড়া, বিশ্ব কূটনীতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্র এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও দায়িত্ব পালন করে থাকে। কোনো বেসরকারি সংগঠনের পক্ষে এরূপ দায়িত্ব পালন করা একেবারেই সম্ভব নয়।

বহুত্ববাদী তাত্ত্বিকগণ সহযোগিতাকে বিশ্বব্যবস্থার এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, সমঝোতার ওপর ভিত্তি করে বিশ্ব-রাজনীতি পরিচালনা করা হবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সামরিক শক্তি রাষ্ট্রের হাতেই কুক্ষিগত আছে। আর বর্তমান কালে রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। ফলে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বলপ্রয়োগের ব্যবহার সদা সর্বদাই দেখা যাচ্ছে।

Courtesy:

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক : তত্ত্ব ও তথ্য

By Arup Sen, Naboday Publication, Kolkata

Suggested Readings:

1. William, P., Goldstein, D. M. and Shafritz, J. M. (eds.) (1999) *Classic Readings of International Relations*. Belmont: Wadsworth Publishing Co, pp. 30-58; 92-126.

2. Art, R. J. and Jervis, R. (eds.) (1999) *International Political Enduring: Concepts and Contemporary Issues*.5th Edition. New York: Longman, pp. 7-14; 29-49; 119-126.

3. Jackson, R. and Sorenson, G. (2008) *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*. New York: Oxford University Press, pp. 59-96.
Buell, Raymond Leslie (1925). International Relations. H. Holt and Company. p. 5.

4. Keohane, Robert O.&; Nye, Joseph S. (2011). Power and Interdependence revisited. Longman Classics in Political Science. p. 58.

5. Crane, George. "The Theoretical Evolution of International Political Economy" (PDF). Oxford University Press. Archived from the original (PDF) on 24 August 2015. Retrieved 9 April 2015.
6. Metxger, Gillian. "Congress, Article IV, and Interstate Relations" (PDF). Harvard Law Review. Retrieved 9 April 2015.
7. Das Pranagobinda, Adunik Rastr Tatwa , Central Publication.